# ১৮৫৭

## স্বাধীনতা যুদ্ধের উপাখ্যান

ইমরান রাইহান

# সূচিপত্র


স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ১০

ঝড়ের পূর্বাভাস ৩২

মিরাট : দাবানলের প্রথম শিখা ৪৬

চূড়ান্ত লড়াই ৭৬

আগ্রা ও মিরাট : দূরবর্তী দাবানল ৯৫

দ্বন্দ্বের সূচনা ১১১

দাবানলের শেষ আগুন ১৩০

স্বাধীনতা সংগ্রাম : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১৪২

প্রাসঙ্গিক ছবি ১৫০

# স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট

১৮৫৭ সাল। ইতিহাসের অবিস্মরণীয় এক অধ্যায়। এই বছরেই উপমহাদেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহে ঝড় তোলে এক মহাবিপ্লব। ব্রিটিশ বেনিয়াকে উৎখাত করে স্বাধীন ভারত ফিরে পেতে দুর্বার সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করেন বিপ্লবীরা। ১৮৫৭ সালের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাবিন্দু কিন্তু লুকিয়ে ছিল তারও একশ বছর আগে, ১৭৫৭ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে। পলাশির ময়দানে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বাহিনীর পরাজয় নিছক একটি যুদ্ধের হার ছিল না, এর সাথে অস্তমিত হয়েছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতার সূর্যও। পরবর্তী সময়ে মির জাফর ও মির কাসেমের হাত ধরে ক্ষমতার নানা পালাবদল চললেও ক্ষমতার নাটাই ছিল ইংরেজদের হাতেই। নিজেদের ক্ষমতার ভিত যত মজবুত হচ্ছিল, ইংরেজদের লুণ্ঠন, অপরাধ ও জুলুমও ততই বিস্তৃত হচ্ছিল। সিরাজুদ্দৌলার পতন ক্লাইভের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি এনে দিয়েছিল বিপুল অর্থলাভের সুযোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চব্বিশ পরগনা জেলার কথা। পলাশির যুদ্ধের পর এই এলাকা ক্লাইভের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এখানকার বার্ষিক আয়ের পুরোটাই চলে যায় ক্লাইভের হাতে। ইংরেজ লেখক জন স্ট্র্যাজির ভাষ্যমতে, শুধু বাংলার কোষাগার থেকেই ক্লাইভ ২ লাখ ৩৪ হাজার পাউন্ড লুট করে নিয়ে যায়। (দ্য এন্ড অব এম্পায়ার, ৩৫)

১৮০৩ সালে জেনারেল লেক এর নেতৃত্বে ব্রিটিশরা দিল্লি দখল করে নেয়। মুঘল

বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম তাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। এ কথা সত্য, মুঘল সম্রাট আলমগিরের বংশধরদের কেউই নিজেকে বাবর, হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের স্বার্থক উত্তরসূরি প্রমাণ করতে পারেননি, কিন্তু তবু তাদের এটুকু গর্ব ছিল যে, তারা স্বাধীন শাসক। কিন্তু দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় থেকে মুঘল শাসকরা হয়ে উঠলেন ইংরেজদের পেনশনভোগী। তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমিত হয়ে এলো, ইংরেজদের বার্ষিক ভাতা নিয়ে লালকেল্লার ভেতরেই সন্তুষ্ট জীবন কাটাতে লাগলেন তারা। দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় দিল্লির লোকজনের মুখে মুখে একটি প্রবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা বলাবলি করত, **খোদাওয়ান্দে আলম, আয দিহলি তা পালম**। অর্থাৎ জগতের শাসক, যার রাজত্বের সীমানা দিল্লি থেকে পালম। উল্লেখ্য, পালম ছিল দিল্লির একটি শহরতলী। (দিহলি তারিখ কে আয়নে মে, ৩৭) জনতার এই ব্যাঙ্গাত্মক কথাটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ সে সময়ের মুঘল শাহির করুণ দশার।

মুঘল সম্রাটকে পেনশনভোগী করার মাধ্যমে ইংরেজরা নিজেদের শক্তির জানান ভালোভাবেই দিয়ে দেয়। তাদের সামনে কার্যত আর কোনো বাধা ছিল না। যদিও বাংলার পতনের পর থেকেই ব্রিটিশ লুণ্ঠন ও অপশাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিরোধ গড়ে উঠছিল, কিন্তু ইংরেজরা নির্মম নিষ্ঠুরতার সাথে দমন করেছিল এসব প্রতিরোধ সংগ্রাম। ফলে মানুষের মনে নানা ধরনের ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এই যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমাদ খানও লিখেছেন, **'দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মনে ক্ষোভের যে বারুদ জমেছিল, তাতে আগুন ধরানোটাই বাকি ছিল শুধু।'** (আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ, ১২)

সুতরাং ১৮৫৭ সালে যা ঘটেছিল তা নিছক দুই-একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল না। প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলমান ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সিপাহি-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের এক জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল এই স্বাধীনতা সংগ্রাম। বিভিন্ন সময় এই ক্রোধ ও ক্ষোভ ধিকিধিকি করে জ্বলে উঠলেও এটি দাবানলের রূপ নেয় ১৮৫৭ সালে। যদিও এই সংগ্রাম ছিল দীর্ঘদিনের জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা প্রতিরোধ, কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, **ঠিক কী কী কারণে এই সংগ্রাম ১৮৫৭ সালেই হলো এবং কেন, কোন কারণে সে সময় এটি অনিবার্য হয়ে উঠল**। বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে গত দেড়শ বছর ধরে লেখালেখি ও গবেষণা হয়েছে বিস্তর। ইংরেজ এবং ভারতীয়-দু-দিকের লোকজনই নিজের মতো করে অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন এবং এখনো চালাচ্ছেন। কেউ কেউ পক্ষপাতদুষ্ট লেখা লিখছেন আবার কেউ লিখছেন

নিরপেক্ষতা ধরে রেখে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরের বছর ১৮৫৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমাদ খান রচনা করেন 'আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ'। এখানে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করেন এবং এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চালান। স্যার সৈয়দ ছিলেন ইংরেজদের একান্ত অনুগত, যিনি তার লেখায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিদ্বেষ লুকানোর কোনো চেষ্টাই করেননি। এমনকি তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম পর্যন্ত বিকৃত করে লিখেছেন তার লেখায়। যেমন : বখত খানকে লিখেছেন কমবখত খান। মাহমুদ খানকে লিখেছেন না মাহমুদ খান।

স্যার সৈয়দ তার এই লেখায় বেশকিছু প্রচলিত ধারণাকে নাকচ করে দেন এবং নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেন। তার মতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে কোনো পরিকল্পনা ও রোডম্যাপ ছিল না। জনগণের মনে বিদেশি শাসনের প্রতি ক্ষোভের কথাও নাকচ করে দেন তিনি। তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেন, সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো অসন্তোষ ছিল না। স্যার সৈয়দের মতে পুরো ব্যাপারটিই ছিল ইংরেজ প্রশাসনের সাথে জনগণের ভুল বোঝাবুঝি। যেহেতু ইংরেজরা ছিল ভিনদেশি, তাই অনেক ক্ষেত্রে তারা এ অঞ্চলের জনগণের মনমানসিকতা বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের অনেক সিদ্ধান্ত এখানকার জনগণের স্বভাব ও রুচিবিরোধী হয়ে পড়ে। এ থেকেই জনগণ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। (আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ, ৮-১২) সৈয়দ সাহেব তার লেখনীর মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল যোদ্ধাদের অপরিণামদর্শী আচরণ ও অপরিকল্পিত ঘটনা।

পরবর্তী সময়ে গবেষক গোলাম রসুল মেহের প্রশ্ন তোলেন, যদি স্যার সৈয়দের দাবিমতে স্বাধীনতা সংগ্রাম হুট করে ঘটা অপরিকল্পিত ঘটনাই হয়, তাহলে স্যার সৈয়দ নিজে কেন স্বীকার করছেন যে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মনে ক্ষোভের বারুদ জমেছিল, শুধু তাতে আগুন ধরানোটাই বাকি ছিল? গোলাম রসুল মেহের দেখান, **দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নানা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল এই সংগ্রাম। এটা নিছক কিছু মানুষের বিষয় ছিল না, বরং এটি ছিল পুরো ভারতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।** (আঠারো সো সাত্তাওয়ান পাক ও হিন্দ কি পেহলি জংগে আযিম, ৩৩)

এবার ১৮৫৭ পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহে নজর ফেরানো যাক, যা পরে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রভাবকের ভূমিকা রেখেছিল।

## ধর্মান্তরের ফিতনা

ভারতীয়দের ক্ষোভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইংরেজদের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া। কোম্পানি প্রশাসন শুরু থেকেই কৌশলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকে উৎসাহ দিচ্ছিল। ১৮১৩ সালে কোম্পানি ধর্মপ্রচারের বিষয়টি নিয়ে শক্তভাবে পদক্ষেপ নেয়। তারা উচ্চ বেতনে পাদরিদের ধর্মপ্রচারে নিয়োগ করে। ইংরেজরা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের বাধ্য করে পাদরিদের আলোচনা শুনতে। এই পাদরিরা বিভিন্ন সময় তাদের লিখিত বইপত্র প্রচার করত, যাতে অন্য ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ব্যাপারে তাচ্ছিল্যকর কথাবার্তা থাকত। ইউপির গভর্নর উইলিয়াম মুয়ার 'লাইফ অব মুহাম্মাদ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে, যেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি করা হয়। **মুয়ার দাবি করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের দাবিটি শয়তানের অনুপ্রেরণা!** নাউযুবিল্লাহ!

স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়রা এসব বই পড়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। মিশনারি স্কুলগুলোতেও জোরেশোরে খ্রিষ্টবাদ প্রচার করা হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ পাদরি এডমন্ডের কথা বলা যেতে পারে। ১৮৫৫ সালে সে পত্রমারফত কলকাতার অনেক অভিজাত পরিবারের সন্তানকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দেয়। পত্রের মধ্যে সে বলে, পুরো ভারতবর্ষ এখন এক শাসনের অধীনে। রেল যোগাযোগের কারণে সব জায়গায় যাতায়াতও সহজ হয়ে গেছে। তাই এখন উচিত হবে তোমরা সবাই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এক হয়ে যাও। (আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ, ১৭)

স্বাভাবিকভাবেই এই পত্র পেয়ে অনেকে অপমান বোধ করেন। এ নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিলে বাংলার গভর্নর একটি বিবৃতি জারি করে পরিস্থিতি শান্ত করে। বিভিন্ন শহরে ক্রমেই পাদরিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কলকাতায় ১৮১৪ সালে ছিল ১৫ জন পাদরি। ১৮৪৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩। মাদ্রাজে ১৮১৪ সালে ছিল ১২ জন পাদরি। ১৮৪৫ এ এই সংখ্যা গিয়ে পৌঁছে ৫০-এ। (ফিরিঙ্গিও কা জাল, ১১১)

স্যার সৈয়দের মতো ইংরেজ অনুগত লেখকও ধর্মপ্রচারে ইংরেজদের বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইতিপূর্বে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ উপাসনালয়ে ধর্ম প্রচার করত। পাদরিরা এর ব্যতিক্রম ঘটায়, তারা অন্য ধর্মের উপাসনালয়ে গিয়েও নিজের ধর্মের দাওয়াত দিতে থাকে। অনেক এলাকায় তারা নিজেদের আলোচনার সময় থানা থেকে এক-দুজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে যেত। আলোচনা শুধু নিজের ধর্মের বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্য ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের আঘাতের পর্যায়ে নিয়ে যেত তারা। **মিশনারি স্কুলের মাধ্যমেও তারা**

**তাদের মিশন জারি রাখে। যে ছাত্ররা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করত তাদের দেয়া হতো বিশেষ পুরস্কার**। (আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ, ১৪)

ধর্মান্তকরণের জন্য গড়ে ওঠে মিশনারিদের নানা সংগঠন। প্রত্যেকেই জোরেশোরে নিজেদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে। (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে ইমদাদ সাবরি রচিত ফিরিঙ্গিও কা জাল বইটি পড়া যেতে পারে। অসাধারণ এই বইটি ভারতবর্ষে মিশনারিদের তৎপরতার ইতিহাস সম্পর্কে তথ্যের খনি) ধর্মান্তকরণের এই বিষয়টি জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের মাত্রা বাড়াচ্ছিল। ১৮৫৪ সালে পাদরি ফান্ডারের ভারত আগমন মিশনারিদের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পাদরি বেশ ভালোই আরবি ফার্সি জানত। ইসলামি বইপত্রেও তার ভালো পড়াশোনা ছিল। এই লোক মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপত্তি তুলতে শুরু করে। কখনো আলোচনায়, কখনো লেখালেখির মাধ্যমে। সাধারণ আলেমগণ, যারা খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে ভালো করে জানতেন না, তারা ফান্ডারের এসব দাবির সামনে অসহায়বোধ করতে থাকেন।

পরবর্তিতে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভি নামে একজন আলেম ফান্ডারের সাথে বিতর্ক করেন এবং প্রমাণ করে দেন ইঞ্জিল ও তাওরাতে অনেক বিকৃতি করা হয়েছে। পরাজিত ফান্ডার অপমান ও ক্ষোভে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। তবে মিশনারিদের কাজকর্ম থেমে থাকে না। তারা নানাভাবে তাদের মিশন বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা চাচ্ছিল এখানকার মানুষকে ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে এ দেশে ইংরেজ শাসনের ভিত মজবুত করতে।

কয়েদিদেরকেও মিশনারিরা খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত দিত। যারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করত তাদের শাস্তি কমানো হতো, তারা পেত নানা সুযোগ সুবিধা। (ইন্ডিয়ান চার্চ ডিউরিং দ্য রেভ্যুলেশন, ১৮৪) মিশনারিদের এসব বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য ১৮৩৬ সালে বলেন, ভারতবর্ষের অনেক মুসলমান আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, ইংরেজ প্রশাসন পাদরিদের সাহায্য করছে। পাদরিরা প্রকাশ্যে ইসলামের নিন্দা করছে। একজন পাদরি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছে, তোমরা মুহাম্মাদের মাধ্যমে নিজের গুনাহ মাফ করাতে চাও, অথচ সে নিজেই হয়তো এখন জাহান্নামে আছে। নাউযুবিল্লাহ! (তারিখে জংগে আজাদিয়ে হিন্দ, ১৪৩)

**ধর্ম প্রশ্নে ইংরেজদের অবস্থান**

ধর্মান্তরের বিষয়টি ছাড়াও ইংরেজদের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ধর্মীয় মহলে অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে। যেমন : শুরুর দিকে কারাগারে নিয়ম ছিল প্রত্যেক কয়েদি নিজের খাবার নিজে রান্না করবে। পরে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় এভাবে বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে। এখন থেকে সবার রান্না একসাথে পাকানো হবে। হিন্দুদের জন্য বিষয়টি ছিল খুবই অস্বস্তিকর। কারণ, জাতপাত প্রথার কারণে ব্রাহ্মণরা কখনোই নিচু জাতের হাতে করা রান্না খেতে প্রস্তুত ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং দাবি করে, ইংরেজরা মূলত খ্রিষ্টবাদকে সুযোগ করে দিতেই তাদের জাতপাত প্রথা বিলোপ করতে চাচ্ছে।

বন্দিদের অনেকে পিতলের পাত্র ব্যবহার করত। ইংরেজরা আশঙ্কা করে, এসব পাত্রের মাধ্যমে কয়েদিরা হয়তো কারও ওপর হামলা করে বসতে পারে। এ জন্য তারা পিতলের পাত্র বাজেয়াপ্ত করে সবাইকে মাটির পাত্র বিলি করে। এদিকে হিন্দুরা কখনোই মাটির পাত্রে খেতে অভ্যস্ত ছিল না। এই বিষয়টিও তাদের বিরক্ত করে। মুজাফফরপুরে এ নিয়ে বিশাল এক হাঙ্গামাও হয়ে যায়। (আঠ্ঠারো সো সাত্তাওয়ান পাক ও হিন্দ কি পেহলি জংগে আযিম, ৪৬)

১৮৫০ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে ইংরেজরা। এই আইন অনুসারে কেউ ধর্মান্তরিত হলেও তার পিতার সম্পদের উত্তরাধিকার সে পাবে। হিন্দু, মুসলমান দুই ধর্মের অনুসারীদের জন্যই এটি ছিল অপমানের শামিল। তারা বুঝতে পারে, এটি মূলত পরোক্ষভাবে মানুষকে খ্রিষ্টধর্মের দিকে উৎসাহিত করার একটি কৌশল। ঘটনা আসলে এমনটাই ছিল। এই আইনে হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য উপকারী কিছু ছিল না। উপকার হয়েছিল সদ্য ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের আইন প্রণয়ন করা হলে হিন্দুরা আবারও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যদিও বাহ্যিকভাবে আইনটি ছিল প্রশংসনীয়, কিন্তু ইংরেজদের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে হিন্দুরা এতে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তাদের মতে হিন্দু ধর্মের বিষয়ে ইংরেজদের এ ধরনের হস্তক্ষেপ ধর্মকে বিকৃত করার শামিল। এ চিন্তা থেকে তারা এই নতুন আইনের তীব্র বিরোধিতা করে। ১৮২৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই ক্ষোভ নতুন মাত্রা পায়। সে বছর ভারতীয় সিপাহিদের সমুদ্র পেরিয়ে কালাপানিতে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। অথচ তখনো হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা নিয়ে নানা রকমের কুসংস্কার লালন করত। এই নির্দেশ মানা তাদের জন্য সহজ ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছুদিন আগে মাদ্রাজের সেনাদের নির্দেশ দেয়া হয় তাদের